সংবাদ

তারিখ 22 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

কোচিং-বাণিজ্য : এক মহামারী

শরীফুল্লাহ মুক্তি

বর্তমানে কোচিং-বাণিজ্য মহামারী আকার ধারণ করেছে। স্কুল ও কলেজের এক শ্রেণীর তথাকথিত শিক্ষক লাগামহীন কোচিং-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন। কোমলমতি শিশুদের পরীক্ষায় নম্বর কম দিয়ে, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করে, বিভিন্ন কলা-কৌশল অবলম্বন করে এই শ্রেণীর শিক্ষকরা তাদের কাছে শিক্ষার্থীদের পড়তে বাধ্য করছেন। এমনকি এ থেকে বাদ যাচ্ছে না, প্রাথমিক স্তরের কোমলমতি শিশুরাও। তাদের কাছে জিম্মি হয়ে আছে ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকরা। প্রাইভেট পড়ানো এবং কোচিং পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও তা কোথাও প্রতিপালিত হচ্ছে না।

আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম একটি যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম। পাঁচ বছর মেয়াদি শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা কী কী যোগ্যতা অর্জন করবে তা সুনির্দিষ্ট করা আছে; এগুলোকে বলা হয় প্রান্তিক-যোগ্যতা। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষায় ২৯টি প্রান্তিক-যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাঁচ বছরব্যাপী শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্ন বিষয়ে ধাপে ধাপে এ যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে বলে আশা করা হয়। প্রান্তিক-যোগ্যতাগুলোকে আবার বিভাজিত করা হয়েছে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক-যোগ্যতায়। একটি বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক-যোগ্যতা কোন শ্রেণীতে কতটুকু অর্জন করবে তা-ও সুনির্দিষ্ট করা আছে। এগুলোকে বলা হয় শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতা। যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক, তাই প্রাথমিক শিক্ষায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়াও শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক হওয়া উচিত। বর্তমানে ক্রমান্বয়ে শতভাগ যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দিকে প্রাথমিক স্তরকে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়ন হলো, বছর শেষে শিক্ষার্থীরা শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাগুলো কতটুকু অর্জন করতে পারল তা যাচাই করা– সেটিও আবার বেঞ্জামিন ব্লুমের শিখনের স্তরভিত্তিক (জ্ঞানমূলক, উপলব্ধিমূলক; প্রয়োগমূলক/উচ্চতর দক্ষতা) হতে হয়। আশা করা হয়, উপযুক্ত শিখন-শেখানোর মাধ্যমে শিক্ষকগণ বিদ্যালয়েই শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্ট শ্রেণীভিত্তিক অর্জনোপযোগী যোগ্যতাগুলো অর্জন করাবেন। এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে সুস্পষ্ট নির্দেশনাও রয়েছে।

এককালে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রাইভেট টিউশন প্রচলিত ছিল শুধু ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে। এ টিউশনে বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতির অংশ হিসেবে পরীক্ষার আগের কয়েক মাস পড়ানো হতো। আমার মনে আছে আমি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন বৃত্তি পরীক্ষার জন্য বছরের শেষের তিনমাস একজন শিক্ষকের কাছে ইংরেজি বিষয়ে প্রাইভেট পড়েছিলাম। বর্তমানে বছরজুড়ে সব বিষয়ে, এমনকি ধর্ম-আরবি-চারুকলার মতো বিষয়েও প্রাইভেট পড়ার সংস্কৃতি চালু হয়েছে এবং এটা চালু হয়েছে প্লে, নার্সারি বা প্রথম শ্রেণী থেকেই। কিশোরগঞ্জ শহরের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী রাতুল বছরের শুরু থেকেই একটি কোচিং সেন্টারে পড়ছে। প্রতিদিন তাকে স্কুল শেষে বিকালে ব্যাগভর্তি বই-খাতা নিয়ে কোচিং সেন্টারে যেতে হয়। আরেক শিক্ষার্থী মারিয়া, সে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ে। সেও বছরের প্রথম দিন থেকে একটি কোচিং সেন্টারে যাচ্ছে। তারা গত বছরও সারা বছরব্যাপী পৃথক দুটি কোচিং সেন্টারে কোচিং করেছে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কোচিংয়ে কি পড়ানো হয়– এ ব্যাপারে আমার কথাও হয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এসব একাডেমিক কোচিং সেন্টার। ঢাকা ও দেশের বড় বড় শহরগুলোতে অনেক শিক্ষক ফ্ল্যাট ভাড়া করে কোচিং সেন্টার চালাচ্ছেন। এসব ফ্ল্যাটে একসঙ্গে ৫০-৬০ জন ছাত্রছাত্রী পড়ানো হচ্ছে। কোচিং সেন্টার পরিচালনার দৃশ্য দেখে বোঝার উপায় নেই যে, এটা কোনো স্কুলের সাধারণ ক্লাসরুম না কোচিং সেন্টার। সেখানে ক্লাসরুমের মতোই আছে হোয়াইট বোর্ড, মাইক্রোফোনসহ আধুনিক সাউন্ডসিস্টেম। কোনো কোনো শিক্ষক বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর চাপ সামলাতে একাধিক সহকারীও নিয়োগ করেছেন। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত এসব একাডেমিক কোচিং সেন্টার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিকল্প হিসেবে ভূমিকা পালন করায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি যেমন কমেছে, তেমনি শিক্ষকরাও প্রতিষ্ঠানে সময় না দিয়ে ব্যক্তিগত কাজে (কোচিং বা টিউশনিতে) জড়িয়ে গেছেন। শহরের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মধ্যাহ্ন বিরতির পর চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর ক্লাসে শিক্ষার্থী পাওয়াই যায় না।

গত শতকের নব্বই দশকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে বিশেষ প্রয়োজনে প্রাইভেট-কোচিং প্রচলিত হয়েছিল। সময়ের পরিবর্তনে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাইভেট বা কোচিংয়ের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে এমনটি মনে করেছিলেন শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হওয়ায় বাণিজ্যিক দিক বিবেচনায় প্রাইভেট-কোচিং আরও ব্যাপকভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষকদের একাংশ। শিক্ষার্থীদের পড়ার বিষয় বেড়ে যাওয়ায় শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্যেরও সুযোগ বেড়েছে। ব্যবসাও হচ্ছে রমরমা। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, এসব কোচিং সেন্টারে শুধু গণিত ও ইংরেজি বিষয় নয়; ধর্ম, বাংলা, চারুকলা, কারিগরি, কৃষিশিক্ষা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের মতো বিষয়েও কোচিং করতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করা হয়। মূলত নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করায় সমস্যা আরও বেশি হচ্ছে বলে আপাতদৃষ্টিতে-পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করার প্রক্রিয়া চালু করেছে সরকার। এ অবস্থায় বাস্তবতা হলো, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রাইভেট-বাণিজ্য বা কোচিং-বাণিজ্যের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছেন ভুক্তভোগী অভিভাবকেরা। কোমলমতি শিশুদের কাছে স্কুলের মুক্ত আঙ্গিনাকে আনন্দময় করার বদলে স্কুলকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা হচ্ছে দিন দিন। অনেক শিশু স্কুলের পরিবর্তে প্রাইভেট শিক্ষকের বন্দী কক্ষে সেরে নিচ্ছে পড়াশোনা। সমাপনী পরীক্ষার জন্য পঞ্চম শ্রেণীর অনেক শিক্ষার্থী সারা বছর স্কুলেই যায় না। শুধু বিভিন্ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে মাত্র। বছরের প্রথম মাস থেকেই শুরু হয় এসব প্রাইভেট বা কোচিং। অনেক অতি উৎসাহী অভিভাবক আবার তাদের সন্তানকে সকালে এক কোচিং এবং বিকেলে আরেক কোচিংয়ে পাঠান। অনেক অভিভাবক কোচিং এবং প্রাইভেট দুটিই চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে অভিভাবকদেরও গুনতে হচ্ছে মোটা অঙ্কের অর্থ। শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে অতিরিক্ত পড়ার বোঝা। প্রাইভেট না পড়লে বিদ্যালয়ে গিয়েও পাচ্ছে না শিক্ষকের সুদৃষ্টি। সরকারি প্রাইমারি স্কুলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতেই ছলে-বলে-কৌশলে শিশুদের প্রাইভেটমুখী করছে একশ্রেণীর শিক্ষা-ব্যবসায়ী কথিত শিক্ষক। প্রাথমিক স্তরের প্রাইভেট-কোচিং সেন্টারগুলো শিশুদের জন্য হয়েছে মরণফাঁদ। বেশিরভাগ প্রাইভেট-কোচিং সেন্টারগুলোর ক্লাস কার্যক্রম শুরু হয় দুপুরের পরে অথবা সন্ধ্যায়। সারা দিন ক্লান্তির পরে কোমলমতি শিশুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হয় প্রাইভেট-কোচিং সেন্টারে। ব্যাগভর্তি বই-খাতা-পেন্সিল নিয়ে এসব শিশু সারাক্ষণ শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতায় ভোগে। অনেক শিক্ষার্থীই এ চাপ সহ্য করতে না পেরে আক্রান্ত হচ্ছে নানা ধরনের মানসিক সমস্যায়। কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোর প্লে-নার্সারি থেকে কেজি-ফাইভ পর্যন্ত অধিকাংশ শিশু-শিক্ষার্থীই প্রাইভেট-কোচিংয়ের ফাঁদে আটকে থাকে। প্রাথমিকস্তরে এ প্রাইভেট-কোচিং শিশুদের শৈশবকে ধ্বংস করছে এবং সৃজনশীলতার বিকাশকেও বাধাগ্রস্ত করে তুলছে। একটি শিশু স্কুলে ভর্তি হয়েই জেনে যায় স্কুল তার জন্য যথেষ্ট নয়। পরীক্ষায় ভালো করার জন্য তাকে দৌড়াতে হবে প্রাইভেট টিউটরের বাসায়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষাক্রম যোগ্যতাভিত্তিক হওয়া সত্ত্বেও প্রাইভেট ও কোচিং সেন্টারগুলো নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জনের দিকে নজর না দিয়ে পরীক্ষায় কিভাবে বেশি নম্বর পাওয়া যায় সেদিকে নজর দিচ্ছে বেশি। পরীক্ষা নিতে সিদ্ধহস্ত– এসব কোচিং সেন্টারগুলো সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, ষাণ্মাসিক পরীক্ষা, বিশেষ পরীক্ষা, মডেল টেস্ট ইত্যাদি নিতে পিছিয়ে থাকে না। এসব পরীক্ষায় ইচ্ছামতো ফি নেয়া হয় অভিভাবকদের কাছ থেকে। শুধু পরীক্ষা ফিই নয়, বেতনের ক্ষেত্রেও নেই কোনো নীতিমালা এসব কোচিং সেন্টারে। এছাড়া বার্ষিক ভর্তি ফিসহ নানা খাত দেখিয়ে বছরে একটি মোটা অঙ্কের ফি হাতিয়ে নিচ্ছে অভিভাবকদের কাছ থেকে। শিক্ষার্থীদের ভিত্তি তৈরির দিকে তাদের কোনো নজর নেই, নেই নজর নৈতিক ও মানবিক শিক্ষার দিকেও।

আরেকটি বিষয় নিয়ে ব্যাপক আকারে কোচিং ব্যবসা হচ্ছে। সেটি হলো নামিদামি স্কুলে ভর্তি নিয়ে। সরকারি ভালো স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করাটা পিতামাতার জন্য সামাজিক মর্যাদার বিষয়– এমন মনোভাব থেকেই নার্সারি ক্লাস পেরোতে না পেরোতেই শুরু হয় ভর্তি যুদ্ধের প্রস্তুতি। সেই সুযোগে রাজধানীর ভালো (!) স্কুলে এবং জেলা শহরের নামিদামি স্কুলগুলোতে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ভর্তি মৌসুমকে টার্গেট করে 'শিক্ষা-বাণিজ্যে' নেমেছেন শিক্ষক নামের এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী। ভর্তির গ্যারান্টিসহ নানা চটকদার বিজ্ঞাপন দিয়ে অলিগলিতে খুলে বসেছেন ভর্তি-কোচিং সেন্টার। অভিভাবকরাও সন্তানকে পছন্দের স্কুলে ভর্তির আশায় হুমড়ি খেয়ে পড়েন এসব কোচিং সেন্টারে। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণীতে ভর্তির নিমিত্তে লিখিত পরীক্ষার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে অভিভাবকেরা রীতিমতো যুদ্ধে নামেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিইসিই) এবং অন্যান্য শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগে থেকেই, অনেকে বছরের শুরু থেকেই সন্তানকে ভর্তি-কোচিং করিয়ে থাকেন। অনেক অভিভাবক সন্তানকে এক কোচিংয়ে পড়িয়ে সন্তুষ্ট নন, সন্তানের ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কোচিং করান ও প্রাইভেট পড়ান। আর এই সব কোচিং সেন্টারে নেয়া হচ্ছে মোটা অংকের ভর্তি ফি এবং শ্রেণীভেদে উচ্চহারে মাসিক বেতন।

শিক্ষার এই বাণিজ্যিকীকরণের মাশুল গুনতে হচ্ছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের তথ্য থেকে জানা যায়, কোচিংয়ের কারণে বর্তমানে শিক্ষা ব্যয়ের সিংহভাগই রাষ্ট্রের পরিবর্তে পরিবারের ওপর বর্তাচ্ছে। দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৯ ভাগ ও সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত (এমপিওভুক্ত) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যয়ের ৭১ ভাগই পরিবার নির্বাহ করে। এই ব্যয়ের সিংহভাগই যায় কোচিং-প্রাইভেটের পেছনে।

স্কুলবিমুখ হওয়ার এ মানসিকতা পরবর্তী সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়েও তার মনে বদ্ধমূল থাকে। এ কারণেই উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়েও ক্লাসে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির হার দিন-দিন বাড়ছে। শহরাঞ্চলের কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যতীত গ্রামের প্রায় সব প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার্থীর উপস্থিতি হতাশাজনক। প্রাথমিকস্তরের শিক্ষকেরা যদি শিশুদের প্রাইভেট কিংবা কোচিং করানো বন্ধ করেন এবং শতভাগ শিশুকে স্কুলমুখী করতে যত্নবান হন, তবে পরবর্তী সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুলমুখী হওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রাইভেট বা কোচিংমুখী হওয়ার প্রবণতাও কমে আসবে। তাই প্রাথমিকস্তরে সর্বাগ্রে প্রাইভেট-কোচিং বন্ধ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। প্রাথমিকস্তরে প্রাইভেট-কোচিং পুরো শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অশনিসংকেত। শিশুর শৈশব এবং বেড়ে ওঠার অমিত সম্ভাবনাকে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য সব মহলের আন্তরিক সদিচ্ছা ও ঐকান্তিকতা একান্ত জরুরি। শিশুদের জন্য স্কুলের আঙ্গিনাকে আনন্দময় ও অনুকূল করার পাশাপাশি তাদের অতিরিক্ত মানসিক চাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।

২০১২ সালের ২০ জুন 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোচিং-বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২' জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে অনুসারে কোনো শিক্ষক নিজ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়াতে পারবেন না। প্রতিষ্ঠান প্রধানের লিখিত অনুমতিসাপেক্ষে অন্য প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ ১০ শিক্ষার্থীকে পড়াতে পারবেন। এই নীতিমালা লংঘন করলে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিও স্থগিত করা হবে। কিন্তু বর্তমানে নীতিমালা সরকারি কাগজেই সীমাবদ্ধ, এর তেমন কোনো সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমানে সরকার শিক্ষা-আইন প্রণয়নের মাধ্যমে শিক্ষকদের প্রাইভেট-কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। তাই সরকার প্রাইভেট-কোচিংয়ে জড়িত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তির বিধান রেখে শিক্ষা আইন প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। এ আইনের লক্ষ্য হলো, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট-কোচিং বিমুখী করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানমুখী করা।

জ্ঞান বিতরণের কাজটি এখন পরিণত হয়েছে বাণিজ্যের প্রধান উপকরণে। কাজেই মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিবোধের উন্নয়ন না ঘটিয়ে শুধু আইন প্রণয়ন করে যে অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয় তা আমরা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে এ পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গবেষণা ও কথাবার্তা কম হয়নি। কিন্তু সদিচ্ছার অভাব, নৈতিকতার অভাব, অব্যবস্থাপনা, অদূরদর্শিতা ও দুর্নীতির ঘূর্ণাবর্তে এর অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। প্রাইভেট ও কোচিং বন্ধসহ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হলে আমাদের আন্তরিকতা ও সততার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

শিক্ষকেরা হচ্ছেন বিদ্যা ও জ্ঞানদাতা। ঘরে ঘরে জ্ঞান প্রদীপ প্রজ্বলনে অনন্য ভূমিকা পালনের জন্য সমাজে তারা পূজনীয় ও সম্মানীয়। জ্ঞানের আলোয় সমাজকে আলোকিত করার মহৎ দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকসমাজ অর্থলোভে মত্ত হয়ে স্বীয় মর্যাদা ও সম্মান ভূলুণ্ঠিত করবেন– বিষয়টি দুঃখজনক। জাতি শিক্ষক-সমাজের কাছে এ ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করে না। ন্যায়-নীতি ও সরকারি নীতিমালার তোয়াক্কা না করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জিম্মি করে শিক্ষকেরা যে কোচিং রাজত্ব কায়েম করেছেন, অভিলম্বে তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। কোচিং বন্ধে প্রয়োজন অভিভাবকদের সচেতনতা ও সহযোগিতা এবং সামাজিক জাগরণ। এ ব্যাপারে অভিভাবকদেরই প্রথম এগিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষককে কোচিং পরিচালনা সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালা মানতে বাধ্য করতে হবে। যারা না মানবে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিশুকে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত হওয়ার সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে প্রাথমিক স্তরে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন ও মাধ্যমিক স্তরে সৃজনশীল পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ করতে কোচিং ও প্রাইভেটের নির্ভরতা কমানোই হবে সময়োপযোগী পদক্ষেপ। নতুবা জাতিকে চরম মূল্য দিতে হবে।

[লেখক : ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি), ময়মনসিংহ]
ahmsharifullah@yahoo.com